Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-V, Issue-II, October 2016, Page No. 1-12
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

পাকীজা মঞ্জরী চৌধুরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The main theme of this article centres round the poet's various thought on Vidyapati which are mainly found in his various essays. In the beginning of the article deep interest in the object has been initiated into the poet's first intimacy with Vidyapati, the first knowledge with Vidyapati at the same time has been said in the beginning with quotations. After that twelve articles relevant to Vidyapati has been discussed.
Those articles are : Bhubanmohini Prativa Abosor Sarojini O Duhkhosangini(1287), Prachin Kabyo Sangraha/ Vidyapati (1288), Vidyapatir Parishisto (1288), Chandidas O Vidyapati (1288), Basantaray (1289), Dub Deoya: Dubibar Sthan (1291), Vidyapatir Radhika (1298), Kabyer Tatparjyo (1304), Sahityo Sristi (1314), Shraban Sandhya (1317), Tatthyo O Sattyo (1331), Sahityorup (1335). In those articles, Rabindranath uncovered the creative side of Vidyapati. In one or two articles in the beginning, there are negative comments though, in the other wise, almost all discussion of Rabindranath hab been very much positive, which indicate maturity of his thought about Vidyapati. At the end of this article, some Maithili poerty of Vidyapati along with the Bengali translation done by Rabindranath is included to show Rabindranath's sincere interest towards Vidyapati.

Key Word: Vidyapati, Rabindranath, Voishnob, Probondho, Podaboli sahity

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর যোগ সুদীর্ঘ ও সুনিবিড়। তাঁর রচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গভীর প্রভাবের কথা সাহিত্যানুরাগী পাঠকমাত্রেরই জানা। তবে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রয়েছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

পদাবলী সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নানা চিন্তাভাবনার ফসল ছড়িয়ে আছে তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও সৃজনশীল সাহিত্যের আনাচে কানাচে। কোথাও বৈষ্ণব কবি তো কোথাও আবার বৈষ্ণব পদ হয়েছে সেইসব রচনার বিষয়। এই রচনাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কিছুটা বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। নানাভাবে তাঁর বিদ্যাপতি বিষয়ক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে বিশেষত প্রবন্ধধর্মী রচনায়। প্রথম বয়সের রচনায় বিরূপ সমালোচনাও যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি আবার পরবর্তীতে তাঁর প্রবন্ধ-গল্প-কবিতায় বিদ্যাপতির কবিতা থেকে বহুল উদ্ধৃতি-প্রয়োগও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাপতির গভীর সংযোগের বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের দিকে ফিরে তাকানো একান্ত প্রয়োজন। এইসব রচনার মধ্যে যেমন রয়েছে বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন, তেমনি আছে

সমালোচনা ও অন্য বৈষ্ণব কবির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা। এছাড়াও রয়েছে বিদ্যাপতির মৈথিলী পদের রবীন্দ্রনাথ-কৃত তর্জমা—যা এই নিবন্ধের সর্বশেষ স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদাবলীর সান্নিধ্যলাভ এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রথম পাঠ ঘটনাক্রমে একই সঙ্গে। ১৮৭৪ সালে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম পদাবলীর সংস্পর্শে আসেন। সে সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় তাঁর *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে: "শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। ...বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত।" *প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ* ১ম খণ্ড *(বিদ্যাপতির পদাবলী)* ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।এই তথ্য অনুসারে অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ বারো-তেরো বছর বয়সে সর্বপ্রথম পদাবলী পাঠ শুরু করেন এবং এই পদাবলী আর কারও নয়, বিদ্যাপতির। পরবর্তীতে ১৮৮১ সালে *ভারতী* পত্রিকায় *প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ* গ্রন্থের সম্পাদনার ত্রুটির তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ— **ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী**— এই শিরোনামে *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব* পত্রিকায় ১২৮৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে শ্রীচৈতন্য, জয়দেব, ও চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রসঙ্গও বেশ মুন্‌শিয়ানার সঙ্গে উত্থাপন করা হয়েছে। পনেরো বছরের কিশোর সমালোচক এই রচনাটিতে গীতিকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, আজকের দিনেও তার গুরুত্ব অপরিসীম: "...এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। ...জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেম প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে।" উনিশ শতকের আধুনিক কবিদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও একবার উল্লিখিত হয়েছে বিদ্যাপতির কথা: "আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি-জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়ত উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন।"

১২৮৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা *ভারতী* তে তিনি সারদাচরণ ও অক্ষয় সরকার সম্পাদিত *প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ* -এর প্রথম খণ্ড *বিদ্যাপতির পদাবলী* বিষয়ে সমালোচনা শুরু করেন। বলা যায় এটিই রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রথম বৈষ্ণব পদাবলীর সমালোচনা। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় এবং সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত *প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ* দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বলিত প্রথম খণ্ড ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রচারিত হয়। ১৮৮১ সালের শ্রাবণ মাসে *ভারতী*তে রবীন্দ্রনাথ তার সমালোচনা করেন এবং সম্পাদনা-রীতি ও অর্থ-ব্যাখ্যার অনেক ত্রুটি দেখিয়ে দেন। *ভারতী*তে প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল **প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ/ (বিদ্যাপতি)।** সম্প্রতি এই সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত *কালানুক্রমিক রবীন্দ্র রচনাবলী* ২য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটির সূচনা অংশ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল: "বিদ্যাপতির ন্যায় অমন একজন লোকপ্রিয় কবির পদসমূহ একত্রে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইল, তাহার টীকা, অর্থ, পাঠ-বিভেদ ও (স্থানে স্থানে) ব্যাকরণের সূত্র বাহির হইল, তথাপি তাহা লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল না, ইহা কেবল বাঙ্গালা দেশের জল বাতাসের গুণে। ...বঙ্গভাষা যাহাদের নিকট নিজের অস্তিত্বের জন্য ঋণী, এমন সকল পূজনীয় প্রাচীন কবিদিগের কবিতা সকলের প্রতি যে-সে যেরূপ ব্যবহারই করুক না, আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া চাহিয়া থাকিব? তাহারা কি আমাদের আদরের সামগ্রী নহে?" তারপর রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ পরোক্ষভাবে কবিতাবলীর টীকা প্রকাশের পাঁচটি পরিহার্য দোষের উল্লেখ করেন: ১/ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ অর্থ ব্যাখ্যা ২/ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাখ্যা ৩/ সহজ শ্লোকের প্যাঁচালো ব্যাখ্যা ৪/ দুরূহ শ্লোক সম্পর্কে নীরবতা ৫/ সংশয়ের স্থানে নিঃসংশয়িত হওয়া।। তখনো কোন ভালো অভিধান ছিলনা। খুবই পরিশ্রম করে তিনি দুরূহ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই সমালোচনা সম্পর্কে

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দাবি: "বৈষ্ণব পদাবলী ও পদকর্তাদের সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম সমালোচনা ইতিপূর্বে বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ।" এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে সমালোচনার মধ্যবর্তী কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল: "পুস্তকে নিবিষ্ট প্রথম গীতিতে কবি রাধিকার শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

"নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি।।
পহিল বদরি সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ।।"

সম্পাদক ইহার শেষ দুইটি চরণের এইরূপ টীকা করিতেছেন:- "প্রথম বর্ষার মত নূতন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দি) বর্ষা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গালেবু অভিধানে থাকিলে এই চরণের অন্যরূপ অর্থ হয়। কিন্তু বদরি শব্দের বর্ষা অর্থও সুপ্রসিদ্ধ নহে। "বর্ষার মত ভাবভঙ্গী প্রকাশ করা" শুনিলেই কেমন কানে লাগে যে, অর্থটা টানাবোনা।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে এই ব্যাখ্যা কিছুটা বানানো ও কৃত্রিম মনে হয়েছে। এই অর্থ-ব্যাখ্যায় 'পুন' শব্দের সার্থকতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তারপর নিজস্ব ব্যাখ্যাটি তুলে ধরেছেন: "রাধা নির্জনে কতবার আপনার উরজ দেখেন, আপনার পয়োধর দেখিয়া হাসেন। সে পয়োধর কিরূপ? না, প্রথমে বদরীর(কুল) ন্যায় ও পরে নারাঙ্গার ন্যায়।" এভাবে আরও বহু পদ উদ্ধৃত করে কবি কখনো সম্পাদকের অর্থ ব্যাখ্যার, টীকার, আবার কখনো অর্থের ব্যাকরণগত ত্রুটি দেখিয়েছেন সমগ্র প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটির শেষের অংশ বেশ কড়া সুরের: "সমস্ত পুস্তকের মধ্যে এত অসাবধানতা, এত ভ্রম লক্ষিত হয়, যে, কিয়দ্দূর পাঠ করিয়াই সম্পাদকের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া যায়। ইহার সমস্ত ভ্রম যে কেবল সম্পাদকের অক্ষমতা বশতঃ ঘটিয়াছে তাহা দেখিবার পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করেন নাই। এত অবহেলা, এত আলস্য যেখানে, সেখানে এ কাজের ভার গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত। ...সম্পাদকের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সত্বেও আমরা তাঁহাকে যে এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ বিদ্যাপতির কবিতা আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী, এবং পাঠক সাধারণকে আমরা উপেক্ষণীয় মনে করি না।" বোঝা যায়, বিদ্যাপতির কাব্যগুণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদনার ত্রুটি নির্দেশ ও সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে সমালোচনা প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালের ভাদ্র সংখ্যার *ভারতী*তে। রচনার শিরোনাম - 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। / উত্তর- প্রত্যুত্তর।' পত্রলেখক-যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়। [প্রকাশক-*প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ*]। এই উত্তরের রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রত্যুত্তর বিন্যস্ত হয়েছে যোগেন্দ্রনারায়ণের পত্রটির নিচেই। এভাবে পরপর যোগেন্দ্রনারায়ণের ও রবীন্দ্রনাথের আরও বাইশটি (মোট চব্বিশটি) উত্তর-প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হয়েছে একই সংখ্যায়। প্রতিটিতেই যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় নতুন কোন পদ তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা, টীকা বা মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ সেগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন সুযুক্তি প্রয়োগ করে। কোথাও বা বিনয়ের সঙ্গে সাহিত্য সমালোচকের বিদ্রূপ করার অধিকার চেয়ে নিচ্ছেন। এর মধ্যে একটি 'উত্তর' এ যোগেন্দ্রবাবু 'এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ' পদটির মধ্যস্থ দুই পঙ্‌ক্তির রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত অর্থের ত্রুটি দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'বোধ করি', এরূপ সন্দেহজ্ঞাপক শব্দ সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে যেখানে অর্থ বুঝতে মনে সন্দেহ থাকে সেখানে তিনি অসঙ্কুচিত ও অসন্দিগ্ধ ভাব দেখাতে পারেন না বলেই এরকম অনিশ্চিত শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এর উত্তরে আবার যোগেন্দ্রবাবু 'শ্রীকৃষ্ণের কুন্তল সাপিনীর মতো', এই অর্থের বিরোধিতা করেছেন; কারণ সাধারনতঃ কৃষ্ণের চূড়ার কথাই শোনা যায়। তাছাড়া কোন এক ব্যক্তি এই পদটির আদিররসঘটিত ব্যাখ্যা করেছিলেন বলেই হয়তো সম্পাদক এর অর্থ করেননি; এই তাঁর অনুমান। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে জানাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণের শরীর-বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোন গূঢ় আদিরসাত্মক ইঙ্গিত পদটিতে আছে বলে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন না।

এখানে ছোটো করে নিজের বক্তব্য জানালেও এই পদটির মর্মার্থ যে কবিকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল এবং এইসব বিতর্কের সূত্র ধরে তিনি যে পদটির সন্দেহাতীত অর্থ উদ্ধারে নিবিষ্ট হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১২৮৮ সালের কার্তিক সংখ্যা *ভারতী*-র ৩৪০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত **বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট** নামক কবির লিখিত প্রবন্ধটিতে: "উপস্থিত সংখ্যক ভারতীতে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমার একটি মাত্র বক্তব্য আছে। 'প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ' সমালোচনায় আমি "এ সখি, কি পেখনু এক অপরূপ" ইত্যাদি পদটির অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার এক স্থানে অর্থ বুঝিতে গোলযোগ ঘটায় সন্দিগ্ধ ভাবে একটা অনুমান-করিয়া-লওয়া ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। আর একবার মনোযোগ পূর্ব্বক ভাবিয়া ইহার যে অর্থ পাইয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কেহ কেহ বলেন এই পদটির আদি-রস-ঘটিত গূঢ় অর্থ আছে; কিন্তু তাহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। সহজে ইহার যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ইহার মধ্য হইতে একটা অশ্লীল আদিরস ঘটিত অর্থ বাহির করা নিতান্ত কষ্ট কল্পনা ও অরসিক কল্পনার কাজ। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে[র] বর্ণনাই ইহার মর্ম্ম।" তারপর রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ পদটি প্রথমে উদ্ধৃত করেন এবং প্রতি পঙ্‌ক্তির স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট অর্থ করে বুঝিয়ে দেন, শ্রীকৃষ্ণের দৈহিক রূপ বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোন গূঢ় অর্থ বোঝানো কবির অভিপ্রায় ছিল না। বিদ্যাপতির কবিতা পাঠে তাঁর এই নিষ্ঠা ও মনোযোগই প্রমাণ করে, তিনি বিদ্যাপতির সৃষ্টিকে কতটা মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সমালোচনা **চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি** *ভারতী*তে ১২৮৮ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রবন্ধটি কিছুটা পরিবর্জিত ও পরিমার্জিত হয়ে ১২৯৪ সালে *সমালোচনা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এই প্রবন্ধে বিদ্যাপতি সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসাসূচক মন্তব্য নেই বললেই চলে। তুলনায় চণ্ডীদাসকে উঁচু আসন প্রদান করা হয়েছে। এটি ১২৮০ সালে *বঙ্গদর্শন* এ লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটির কথা মনে করায়। দুজনের লেখা তুলনা করলেই তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আছে মননশীলতা, চিন্তাশীলতার ছাপ। তিনি জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্য সম্পর্কে যেসব সাধারণ মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত করেছেন তার পেছনে লেখকের সজাগ বুদ্ধিবৃত্তি বোঝা যায়। তবে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু মন্তব্যই করেছেন, নিজের বক্তব্যকে দৃষ্টান্ত ও বিচারের দ্বারা সমর্থন করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের যুক্তির সমর্থনে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন এবং তাঁর সমালোচনায় বক্তব্য আরও গভীর হয়েছে। তাঁর লেখায় আছে যুক্তি, অনুভব ও মর্মগ্রাহিতার সমন্বয়; এককথায় তীক্ষ্ণ মনন ও গভীর সহৃদয় সংবেদনার সংযোগে প্রকৃত সাহিত্য সমালোচকের রসদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায়। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতি অপেক্ষা বড় কবি বলেছেন। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাপতি-সম্পর্কিত মতের বিপরীত মতও ঘোষণা করেছেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকে বলেছেন দুঃখের কবি, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সুখের কবি। বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতিকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনায় বিদ্যাপতির সেই ভূমিকার বদল হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক: "আমাদের চণ্ডিদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বাঙ্গলার সকল প্রাচীন কবিদের শ্রেষ্ঠ। তিনিই বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহারই জন্য কবি। ...তিনি এক ছত্র লেখেন, ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন।

...বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন। চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগত বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি উপভোগের কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ। কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তিনি সুখের চখেও অশ্রুজল দেখিতে পান।" এই অংশটি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির কালে কিছুটা বর্জিত ও পরিবর্তিত হয়। যেমন- 'বিদ্যাপতি উপভোগের কবি' স্থলে গ্রন্থে মুদ্রিত আছে 'বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি'। হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে

'ভোগ' শব্দটির দ্বারা বিদ্যাপতির প্রকৃতিকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যাবে। তাই এই বলিষ্ঠ পরিবর্তন। আবার উদ্ধৃতির শেষ ছত্র 'তিনি সুখের চখেও অশ্রুজল দেখিতে পান।' --গ্রন্থপাঠে বর্জিত। এই ছত্রটি বর্জনের সঠিক কারণ অনুমান করা কঠিন, কারণ চণ্ডীদাসের মনোভাব এই ছত্রটির মাধ্যমে যতটা অন্তরঙ্গভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তাতে এই পঙ্‌ক্তি রচনার নেপথ্যে লেখকের গভীর ভাবনা-চিন্তা ও সূক্ষ্ম উপলব্ধির ছাপ স্পষ্ট।

এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত পদগুলি হল যথাক্রমে:

১। এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা,
২। সই কেমনে ধরিব হিয়া?
৩। কহে চণ্ডিদাস, শুন বিনোদিনী
৪। সই পিরীতি না জানে যারা
৫। দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল, (বিদ্যাপতি)
৬। এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে,
৭। সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
৮। কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান,
৯। বঁধু, যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও
১০। তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই
১১। অনুক্ষণ গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকলে,
১২। যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল
১৩। পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
১৪। পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি,
১৫। পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
১৬। নিতই নূতন পিরীতি দুজন
১৭। সখি রে,কি পুছসি অনুভব মোয় (বিদ্যাপতি)
১৮। প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মূরতি
১৯। পিরীতি নগরে বসতি করিব
২০। কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে
২১। চণ্ডিদাস চরণ চিন্তামণি গণ

শিরে করি ভূষা গোবিন্দদাসের কবি-বন্দনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তালিকার শেষ চারটি পদ (১৮-২১) *ভারতী*তে থাকলেও গ্রন্থে প্রকাশকালে সেগুলি বর্জিত হয়।

লক্ষণীয়, বিদ্যাপতির দু একটি পদ ছাড়া প্রায় সব পদই চণ্ডীদাসের। বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া, উল্লেখের সংখ্যাগত পরিমাণেও কবি চণ্ডীদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমধিক আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে।

পরবর্তী বিদ্যাপতির প্রসঙ্গযুক্ত প্রবন্ধটির নাম **বসন্তরায়**। বসন্তরায়কে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যাপতির সঙ্গে অভিন্ন করে ভাবা হত। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিদ্যাপতির ভাব-ভাষা ইত্যাদির সঙ্গে বসন্তরায়ের ভাব-ভাষা-প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে বিদ্যাপতি ও বসন্তরায় সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই ব্যক্তি। অবশ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না- সে সম্বন্ধে তিনি প্রথমেই তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করে নিয়েছেন। *প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ*তে বসন্তরায়ের পদাবলী ছিল। 'বসন্তরায়' প্রবন্ধটি শ্রাবণ সংখ্যা *ভারতী*তে ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং পরে তা *সমালোচনা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটিও গ্রন্থভুক্তিকালে কিছুটা পরিবর্জিত হয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত হয়েছে। এই নিবন্ধে

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কীভাবে কাব্য-পাঠের দ্বারা কবিকে চিনে নেওয়া যায়। ইংরেজি সমালোচনায় যাকে বলে internal evidence, কবিপুরুষকে চিনবার সেই অন্তর্নিহিত সাক্ষ্যের অনুসন্ধান করেছেন বসন্তরায়ের কাব্যে বসন্তরায়কে চেনার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমত আলোচনা করেছেন বিদ্যাপতি ও বসন্তরায়ের ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে। বিদ্যাপতির লেখায় ব্রজভাষা ও বাংলার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু বসন্তরায়ের ভাষায় বাংলায় ব্রজভাষার মিশেল, অর্থাৎ প্রাধান্য বাংলা ভাষারই। বিদ্যাপতি বা অন্যান্য কবিরা ব্রজভাষাকে 'কবিতার অফিসের বস্ত্র' ভাবতেন। তাই শ্যামের বিষয় বর্ণনা করতে হলে আটপৌরে ভাষার সাজ ছেড়ে ব্রজভাষার আমদানি করে বৃন্দাবনী সাজসজ্জার একটা বোঝা বয়ে বেড়াতেন। বসন্তরায়ের এসব বিশেষ পছন্দ ছিলনা, তাই কিছুটা ব্রজভাষা প্রয়োগের পর তিনি আটপৌরে বাংলায় সহজ বর্ণনায় পদাবলী রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়: "বসন্তরায়ের কবিতার ভাষাও যেমন, কবিতার ভাবও তেমন। সাদাসিধা; উপমার ঘনঘটা নাই; সরল প্রাণের সরল কথা; সে কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়াই মিথ্যা।" ভাষার পরে দ্বিতীয় পার্থক্য দেখিয়েছেন কবিতার ভাবে। অত্যধিক জটিল অলংকার উপমার মধ্যে সুকুমার ভাবগুলির প্রাণছোঁয়া কথা শোনা যায় না। তাই বসন্তরায়ের কবিতার ভাব সহজ সরল মর্মস্পর্শী, বিদ্যাপতির ভাব অত্যন্ত পোশাকি, অলংকার-উপমার আড়ম্বরে আকীর্ণ। বিদ্যাপতির সঙ্গে যেমন চণ্ডীদাসের তুলনা করলে বোঝা যায়, চণ্ডীদাস কত সহজ সরল ভাবের উপস্থাপক, তেমনি "বিদ্যাপতির সহিত বসন্তরায়ের তুলনা করিলেও দেখা যায়, বিদ্যাপতির অপেক্ষা বসন্তরায়ের ভাষা ও ভাব কত সরল।" এ কথার প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও বসন্তরায়-- দুজনের রচিত শ্রীরাধার মুখে শ্যাম-রূপ বর্ণনার পদ উদ্ধৃত করে সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বিদ্যাপতির বর্ণনায় গভীর ভাবের ছোঁওয়া অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত; "কতকগুলি টানাবোনা বর্ণনা করিয়া গোটাকতক ছত্র মিলাইয়া দিয়াছেন।" বিদ্যাপতির উদ্ধৃত কবিতাটির প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি হল- "এ সখি কি দেখনু এক অপরূপ,/ শুনাইতে মানবি স্বপনস্বরূপ।" অন্যপক্ষে, বসন্তরায়ের "সজনি, কি হেরিনু ও মুখ শোভা" পদটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য: "বসন্তরায়ের কৃষ্ণবর্ণনা পড়িয়া দেখ। কবি এমন ভাবে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন যে, প্রথম ছত্র পড়িয়াই আমাদের প্রাণের তার বাজিয়া ওঠে।" রবীন্দ্রনাথ দুই কবির তুলনা করে বলেছেন: "বিদ্যাপতির রচিত বর্ণনাটি সমস্তটাই বস্তুগত। বসন্তরায়ের ভাবগত। বিদ্যাপতি শ্যামের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুটিনাটি করিয়া বর্ণনা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু বসন্তরায় তাহা করেন নাই।" এখানে দেখা যায়, তৃতীয় পার্থক্য কবিতার বিষয়বস্তু পরিবেশনে বা প্রকাশভঙ্গিতে। বিদ্যাপতির বস্তুগত ও বসন্তরায়ের ভাবগত দিকের বর্ণনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত বলা যায়, শেষের যে কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, গ্রন্থে সেগুলি বর্জিত। হয়তো এভাবে বিদ্যাপতি সম্পর্কে বলাটা পরে রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছুটা রুচিবিরুদ্ধ মনে হয়ে থাকতে পারে; যার জন্য এই পরিবর্জন।

চতুর্থ পার্থক্য উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা। এই পার্থক্য ধরা পড়ে উভয় কবির রূপ-বর্ণনামূলক পদের মধ্যে। "বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রূপ উপভোগ্য বলিয়া সুন্দর, আর বসন্তরায় কহিতেছেন রূপ সুন্দর বলিয়া উপভোগ্য। ইহা সত্য বটে, সৌন্দর্য ও ভোগ একত্রে থাকে, কিন্তু ইহাও সত্য উভয়ে এক নহে। সৌন্দর্যস্পৃহা হইতেও ভোগ করা যায় এবং ভোগস্পৃহা হইতেও ভোগ করা যায়। যাহার যেমন মনের গঠন। বসন্তরায় তাহার রূপবর্ণনায় যাহা কিছু সুন্দর তাহাই দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি তাঁহার রূপ-বর্ণনায় যাহা কিছু ভোগ্য তাহাই দেখাইয়াছেন।" পরবর্তী পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বসন্তরায়ের কবিতায় আরেকটি মোহমন্ত্র আছে, যাহা বিদ্যাপতির কবিতায় সচরাচর দেখা যায় না। বসন্তরায় প্রায় মাঝে মাঝে বস্তুগত বর্ণনা দূর করিয়া দিয়া এককথায় এমন একটি ভাবের আকাশ খুলিয়া দেন, যে, আমাদের কল্পনা পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া যায়, মেঘের মধ্যে হারাইয়া যায়।" অর্থাৎ বসন্তরায়ের কবিতায় ভাবগত বিস্তারের অনুভূতি যা বিদ্যাপতির কবিতায় অনুপস্থিত। তারপর বসন্তরায়ের 'আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব?' -সম্পূর্ণ পদটি উদ্ধৃত করে বলেছেন: "এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহার একেকটি সম্বোধন চমৎকার।"

সমগ্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বসন্তরায়ের বহু পদ উদ্ধৃত করে বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হল- "প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি?/ তোমা বিনা মন করে উচাটন/ কে জানে কেমন তুমি!/ ...তিলেক থির নাহি বাঁধি!" পদটির প্রথম অংশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "ইহার প্রথম দুটি ছত্রে, ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! ...এত দেখিলাম এত পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" বিদ্যাপতি যে এত করিয়া বলিয়াছেন,

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল!"

তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক ভাল। বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন ইহার এককথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে। ...দ্বিতীয় ছত্রে রাধা শ্যামের মুখের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া কহিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!" যাহার একতিল ঊর্ধ্বে উঠিলেই ভাষা মরিয়া যায়, সেই, ভাষার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া রাধা বলিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!" এত উচ্চে বিদ্যাপতি কখন উঠেন না, এবং ইহার ঊর্ধ্বে রায়বসন্ত স্বয়ং উঠিতে পারেন না।"

এখানে একটি কথা উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল- রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গ-সূত্রে বিদ্যাপতির 'লাখ লাখ যুগ' পদটি ব্যবহার করেছেন এবং এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ভাবের গভীরতা, বক্তব্যের সংহতি ও শৈল্পিক উৎকর্ষের কথা বলেছেন। অথচ এখানে বসন্তরায়কে বিদ্যাপতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবি প্রমাণের তাগিদে এই বহুশ্রুত পদটি সম্পর্কেও তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে নেতিবাচক মন্তব্য করলেন। মনে হয়, তরুণ রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ রচনাকালে বসন্তরায়ের প্রতি অধিক ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন, যার জন্য বিদ্যাপতির প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি। নতুবা 'লাখ লাখ যুগ' এর মত পদ অপেক্ষা বসন্তরায়ের একটি সাধারণ মানের পদের হয়ত এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন না। নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ বসন্তরায়ের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেও বিদ্যাপতিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে বৈষ্ণব কবিতার বহিঃসৌন্দর্য অপেক্ষা ভাবের নিবিড়তার প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন। প্রসঙ্গত, কয়েকমাস আগে লেখা 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি স্মরণীয়। তেমন কোন ভাবনা থেকেই হয়তো তুলনায় স্বল্প পরিচিত বসন্তরায়ের পদাবলী সম্পর্কে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। তাহলেও কবির সমালোচনায় তথ্যের যথার্থতা ও বিচারনৈপুণ্য লক্ষ করে কবির সঙ্গে একযোগে স্বীকার করতেই হয় যে বিদ্যাপতি ও বসন্তরায় এক কবি নন, এমন কি এক শ্রেণিরও কবি নন।

উপরে আলোচিত বিদ্যাপতির পদটি ('জনম অবধি হম') রবীন্দ্ররচনায় অন্ততঃ আঠারোবার উদ্ধৃত হয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। তবে ১২৯১ সালে (১৮৮৪) সম্ভবত প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ 'জনম অবধি হম'-এই অংশের ইতিবাচক ব্যাখ্যা করেন **ডুব দেওয়া: ডুবিবার স্থান***(আলোচনা)* প্রবন্ধে: "একটা মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশীক্ষণ লাগে না--কিন্তু আজন্মকাল দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না-জানি কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক একজন মানুষের মধ্যস্থিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না। ... এই জন্যই যথার্থ অনুরাগের মধ্যে একপ্রকার ব্যাকুলতা আছে। সে এতখানি পায় যে তাহা প্রাণ ভরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না--- তাহার এত বেশি তৃপ্তি বর্তমান, যে, সে তৃপ্তিকে সে সর্বতোভাবে অধিকার করিতে পারে না ও তাহা সুমধুর অতৃপ্তিরূপে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে।" তরুণ রবীন্দ্রনাথের এই গভীর বিশ্লেষণী শক্তি বিস্ময়কর। বিদ্যাপতির পদাবলীর গভীরতা ও চিরন্তন বাণীকে এই প্রবন্ধে তিনি সার্থকভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন।

পরবর্তী আলোচ্য নিবন্ধ **বিদ্যাপতির রাধিকা** ১২৯৮ সালের চৈত্র সংখ্যা *সাধনা*তে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটি *আধুনিক সাহিত্য* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি -দুই কবির রচনাকে একটি বিশেষ দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। সেটি হল প্রেম। দুই কবি রাধিকার প্রেমমূর্তি যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তার থেকেই বোঝা যায় দুজনের কাব্যে প্রেমের কোন্ রূপ ধরা পড়েছে। উভয়ের পার্থক্য প্রবন্ধের প্রথমেই ব্যক্ত করা হয়েছে: "গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গি, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পত্রিকায় বানান 'চণ্ডিদাস', কিন্তু গ্রন্থে সর্বত্র 'চণ্ডীদাস' লিখিত। শেষে প্রাবন্ধিক 'জনম অবধি হম' পদটি উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন এইভাবে: "নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল। ইহার পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্তন করা আবশ্যক। চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস আসিয়া চিরপুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।" এখানে বিদ্যাপতির কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বেশ সুচিন্তিত ও পরিণত। বলা যায়, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—দুই কবিকেই এই প্রবন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হয়েছে।

পঞ্চভূত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত **কাব্যের তাৎপর্য** (১৩০৪) প্রবন্ধে বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি এসেছে ব্যোম এর উক্তিতে। বিদ্যাপতির সেই একই পদ 'সখি হে, কি পুছসি অনুভব মোয়' থেকে দুটো পঙ্‌ক্তি পৃথকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে --(ক)'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল' (খ) সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ না গেল'।

সাহিত্য গ্রন্থভুক্ত **সাহিত্যসৃষ্টি** (১৩১৪) প্রবন্ধে সৃজনশীল মনে সাহিত্য কীভাবে সৃষ্টি হয়ে উঠে তার আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির পদের উদাহরণ দিয়ে বললেন: "যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি, অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ--ঐ যেমন বিদ্যাপতির—ভরা বাদর মাহ ভাদর,/ শূন্য মন্দির মোর—সেও আমাদের মনের বহু দিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোন সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা বাদলে ভাদ্র মাসে শূন্যঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কত কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে; যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল অমনি সকলেরই এই অনেকদিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।" কিছু পরে আবার মানবসাহিত্যে ছড়ানো ভাবের এক হয়ে ওঠার প্রয়াস প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির কথা এসেছে: "মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে—স্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে বিদ্যাপতির বলা চলে না। মূল কবির প্রায় কিছুই তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালি গায়ক ও বাঙালি শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমন-কি, তাহার রসেরও পরিবর্তন হইয়া সে এক নূতন জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ...অথচ নানা কাল ও নানা লোকের দ্বারা পরিবর্তন-সত্ত্বেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের মত হইয়া যায় নাই। কারণ একটা মূল সুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। সেই সুরটুকুর জোরেই এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিতেছি, আবার আগাগোড়া পরিবর্তনের জোরে এগুলিকে বাঙালির সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।"

শান্তিনিকেতন গ্রন্থের একাদশ খণ্ডে **শ্রাবণ সন্ধ্যা** (১৩১৭) প্রবন্ধের শেষ অর্ধাংশ জুড়ে শুধুই বিদ্যাপতির 'এ সখি, হমারি দুখের নাহি ওর' পদটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তিকে আশ্রয় করে অখণ্ড দার্শনিক উপলব্ধির বর্ণচ্ছটা প্রবন্ধকে অনন্য উজ্জ্বলতা দান করেছে। সেই বিস্তারিত ভাবনার কিছু নির্দিষ্ট অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল: "আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, ...সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলি করুণ গান জেগে উঠ্‌চে ----

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

...সেই চিরদিন রাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্চে না।

আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেন না বিরহ মিলনেরই অঙ্গ।...

... মানুষ কবি সেইসব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে--

"ভরা বাদর মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!" ...

...আজ কেবলি মনে হচ্চে এই যে বর্ষা, এত এক সন্ধ্যার বর্ষা নয় এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণ ধারা। ...আমার সমস্ত আকাশ ঝর্‌ঝর্‌ করে বল্‌চে-- "কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।"...

বিরহ সন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে, "কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে"--তাহলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না; --কিন্তু শুধু কেমন করে কাটবে নয় ত-- "কেমন করে কাটবে হরি বিনে দিনরাতিয়া" --সেই জন্যে "হরি বিনে" কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ! ...এই জীবন ব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি এবং তারই মাঝখানে গভীর ভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ-সুরের বাঁশী বাজাচ্ছেন সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।!" এই নিবিড় উপলব্ধি যে বৈষ্ণবীয় অধ্যাত্ম চেতনার সমধর্মী সে কথা এখানে স্পষ্ট। রাধাকৃষ্ণের রূপকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব যেভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায় ব্যাখ্যা করে, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বিদ্যাপতির পদকে অবলম্বন করে সেই দার্শনিক তত্ত্বকেই অনুসরণ করেছেন।

সাহিত্যের পথে গ্রন্থের **তথ্য ও সত্য** (১৩৩১) প্রবন্ধে মোট পাঁচবার পদাবলীর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সাহিত্যের মূল স্বরূপকে বোঝানোর জন্য। প্রথম পদাংশটি বিদ্যাপতির 'যব গোধূলিসময় বেলি' পদের প্রথম চার পঙ্‌ক্তি থেকে গৃহীত: "বিদ্যাপতি লিখেছেন--যব গোধূলিসময় বেলি/ ধনি মন্দির বাহির ভেলি,/ নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।" এখানে শেষের দুটি পঙ্‌ক্তিকে রবীন্দ্রনাথ টানা একটি পঙ্‌ক্তিতে উদ্ধৃত করেছেন। প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা কবিতার মাধ্যমে কেমন চিরন্তন চিত্র হয়ে মানসপটে ফুটে ওঠে, সেকথা বোঝাতেই এই পদাংশটি উল্লেখ করে তারপর মন্তব্য করেছেন: "গোধূলিবেলায় পূজা শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে, আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে। এ কবিতা কি শব্দরচনার দ্বারা তারই পুনরাবৃত্তি। জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্বমুক্ত ভাবে সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য। তা কখনোই স্বীকার করতে পারি নে। বস্তুত মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষমাত্র করে ছন্দে বন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা-সংযোগে যে-একটি সমগ্র বস্তু তৈরী হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।" রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় এই কবিতাটির ব্যঞ্জনা যেন নবরূপে পাঠক-চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চতুর্থ উদ্ধৃতিও রবীন্দ্রনাথ বহুবার বিভিন্ন রচনায় বব্যবহার করেছেন-- "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল,/ লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয় জুড়ন ন গেল।" পদকর্তা-বিদ্যাপতি; পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি হল- "সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়"।

একই গ্রন্থের **সাহিত্যরূপ** (১৩৩৫) প্রবন্ধে যে কোন পদ্য কখন সার্থক কাব্য হয়ে ওঠে সে কথা বোঝাতে গিয়ে আবার বিদ্যাপতির 'যব গোধূলি সময় বেলি' পদটির শরণাপন্ন হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ: "দেবালয় থেকে বাহির হয়ে গোধূলির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সুন্দরী চলে গেল, এই একটি তথ্যকে কবি ছন্দে বাঁধলেন--

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নবজলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম-- সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে রয়ে গেল।" বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথের লেখনীর যাদুতে এই বহু পরিচিত পদটি পাঠক মনেও অসাধারণ হয়ে গেঁথে রইল।

এছাড়াও বিদ্যাপতির পদের উদ্ধৃতি ও উল্লেখ ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের আরও বিভিন্ন প্রবন্ধে। তবে প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলিতে যেমন বিদ্যাপতির কবিসত্তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, পরবর্তী সময়ে সেরকমভাবে পাওয়া যায় না। মূলত বৈষ্ণব পদাবলীর উদাহরণের মাধ্যমে সাহিত্যের বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়কে তুলে ধরাই পরবর্তী প্রবন্ধগুলির মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এই লক্ষ্যকে সম্পূর্ণতা দানে বিদ্যাপতির পদাবলী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলা যায়। আরেকটি বিষয়ও এই আলোচনায় লক্ষণীয়; তা হল, বিদ্যাপতি সম্পর্কে প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা বিরূপ মন্তব্য করে থাকলেও পরিণত জীবনে বারবার তাঁর লেখনীতে বিদ্যাপতির কবিতা সম্বন্ধে মুগ্ধতার কথা উঠে এসেছে। প্রথম জীবনে যে বিদ্যাপতির কবিতায় ভোগ ও চাঞ্চল্য দেখেছেন, সেই কবিরই বিরহের পদ পরবর্তী সময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক মননকে উদ্দীপিত করেছে। বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তার এই ক্রমপরিণতি ধরা পড়েছে এই সব প্রবন্ধে।

বিদ্যাপতির প্রবন্ধের আলোচনার শেষে বিদ্যাপতির মৈথিলী পদের রবীন্দ্রনাথ কৃত বাংলা তর্জমা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদত্ত হল।

১৮৮২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় গ্রিয়ার্সন এর *মৈথিলী পদসংগ্রহ*। এতে ছিল বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট মৈথিলী পদগুলি। বর্তমানে এটি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-ভবন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গ্রন্থটি ক্রয় করেন এবং অভিনিবেশ সহকারে পদগুলি পাঠ করেন। গ্রন্থটিতে সংকলিত বিদ্যাপতির বিরাশিটি মৈথিলী কবিতার মধ্যে তিয়াত্তরটি তিনি বাংলায় কোনটি আংশিক, কোনটি-বা পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দুর্বোধ্য মৈথিলী শব্দের অনেকগুলির বাংলা অর্থও তাঁর স্বহস্তে গ্রন্থে লিখিত আছে। রবীন্দ্রনাথ-কৃত সেইসব তর্জমা ও রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা গেল। গ্রন্থটি বাঁধানোর সময় পাশ থেকে পৃষ্ঠা কেটে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না; সেগুলির সম্ভাব্য-পাঠ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

(১) পৃষ্ঠা ৪২, পদ নং-১, মূল পঙ্‌ক্তি: 'নীজ কর কমল আনি তুঅ দেবা।।' রবীন্দ্রনাথ এই ছত্রটির নীচে পেন্সিল দিয়ে রেখাঙ্কিত করে ডান পাশে প্রশ্নবোধক (?) চিহ্ন দিয়ে লিখেছেন- "[দে] বতা নিজ করকমলে আনিয়া থুইয়া গেছে।"

(২) পৃষ্ঠা ৪২, পদ নং-৩, মূল পঙ্‌ক্তি: 'অপ্পন কাজ কব্যোন নহি বন্ধ।' এর বাঁ পাশে লেখা- "আপন কাজ কেনা করে।" পৃষ্ঠার নীচে তারকা-চিহ্ন দিয়ে লিখেছেন- "মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ। অনুবন্ধ- Devotion, Service devotes attendance."

(৩) পৃষ্ঠা ৪৩, পদ নং ৩, মূল পঙ্‌ক্তি: 'বড় অনুরোধ বড়া পয় রাখ।।' এটি শেষের পঙ্‌ক্তি এবং কোন রকম রেখাচিহ্ন দেওয়া নেই। তবে ডান পাশে লেখা- "বড়র অনুরোধ বড়তেই রাখে।"

(৪) পৃষ্ঠা ৪৩, পদ নং ৪, মূল পঙ্‌ক্তি: 'এক সরঁ মনমথ দুহু জিব মার।। নীচে লেখা- "মন্মথ এক শরে দুঁহু প্রাণে মারে।"

(৫) পৃষ্ঠা ৪৩, পদ নং ৬, মূল পঙ্‌ক্তি: 'সপনউঁ রূপ বচন এক ভাখিয়ে/ মুখ সঁ দূরি করু চীরে।।' রবীন্দ্রনাথ ছত্র দুটির পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে নীচে লিখলেন- "এক স্বপ্নরূপ, মুখ হইতে বস্ত্র খুলিয়া এক কথা কহিল।" একই পদের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'পাওলি' শব্দটি রেখাঙ্কিত করে ডান পাশে লেখা- "প্রাপ্ত হওয়া = হওয়া।"

(৬) পৃষ্ঠা ৪৪, পদ নং ৬, মূল পঙ্‌ক্তি: 'কৈ বেরি কাটি বনাওল নব কয়'। পৃষ্ঠার উপর দিকে লেখা- "কতবার কাটিয়া নুতন করিয়া বানাইল।"

(৭) পৃষ্ঠা ৪৪, পদ নং ৬, মূল পঙ্‌ক্তি: 'ই সভ লছমি সমানে।' ডান পাশে রবীন্দ্রনাথের তর্জমা- "এ সকল (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) লক্ষ্মীর সমান।"

(৮) পৃষ্ঠা ৪৪, পদ নং ৭, মূল পঙ্‌ক্তি: 'তুঅ অভিসার কয়লি জত সুন্দরি-/ কামিনি করু কে আনে।।' ডান পাশে তর্জমা- "সুন্দরী রমণী তোমার অভিসার যত করিয়াছে, এত আর কে করিয়াছে?"

(৯) পৃষ্ঠা ৪৪, পদ নং ৭, মূল পঙ্‌ক্তি: 'কাম প্রেম দুঔ এক মত ভয় রঔ / কখনে কী ন করাবে।।' ডান পাশে লেখা- "কাম প্রেম উভয়ে যদি একমত হইয়া থাকে তবে কখন্ কি না করায়।"

(১০) পৃষ্ঠা ৪৫, পদ নং ৮: 'বেয়াজ' শব্দটির নীচে রেখাঙ্কিত করে পাশে লেখা 'concent'. 'গোএ' শব্দটির নীচে রেখাঙ্কিত করে পাশে লেখা 'গোপন করে'। 'উকুতি' শব্দটির নীচে রেখাঙ্কিত করে পাশে লেখা 'উক্তি'।

(১১) পৃষ্ঠা ৪৬, পদ নং ১১, মূল পঙ্‌ক্তি: 'বিহ মোর পরসন ভেল। রঘুপতি দরসন দেল।।' 'পরসন' শব্দটির নীচে রেখাঙ্কিত করে বাঁ পাশে লেখা-'প্রসন্ন'। আবার 'রঘুপতি'-র নীচে রেখাঙ্কিত করে ডান পাশে মন্তব্য করেছেন-"রঘুপতি কেন? বিধাতা প্রসন্ন হওয়া এবং রঘুপতির দর্শন পাওয়া বোধ করি একই কথা।"

(১২) পৃষ্ঠা ৪৬, পদ নং ১৩, মূল পঙ্‌ক্তি: 'পূরুব সুকৃত ফল কেদঔ পাওত/ মদন মহা সিধি আজে।।' ডান পাশে তর্জমা- "পূর্ব্য সুকৃত ফলে মদন মহাসিদ্ধি কে আজ পাইতেছে?"

এছাড়াও সম্পূর্ণ পদের পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরও আছে বেশ কয়েকটি। সেগুলি থেকে দুটি উদাহরণ দেওয়া হল-

(১) পৃষ্ঠা ৪২, পদ নং ২, মূল পদ: "কণ্টক মাহ কুসুম পরগাসে।/ বিকল ভমর নহিঁ পাবথি বাসে।।/ ভমরা ভরমে রমে সভ ঠামেঁ।/ তুঅ বিনু মালতি নহিঁ বিসরামে।।/ ও মধুজীব তোঁহেঁ মধুরাসে।/ সংচি ধরিএ মধু মনহিঁ লজা সে।।/আপন হুঁ মন দয় বুঝু অবগাহে।/ ভমর মরত বধ লাগত কাহে।।/ ভনহিঁ বিদ্যাপতি তোঁ পয় জীবে।/ অধর সুধা রস জৌঁ পয় পীবে।।" এই পদের বাঁ দিকে রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর লিখিত এইভাবে: "কণ্টক মাঝারে কুসুম পরকাশ।/ বিকল ভ্রমর সেথা নাহি পায় বাস।।/ ভরম ভরে ভ্রমর রমিছে নানা ঠাঁই।/ তুহু বিনা হে মালতী বিশ্রাম নাই।।/ ও যে মধুজীবী তোমার মধু চায়।/ সঞ্চিত রেখেছ মধু মনের লজ্জায়।।/ আপনার মন দিয়া বুঝ সুবিচারে।/ ভমর বধের দায় লাগিবে কাহারে?/ বিদ্যাপতি ভণয়ে তখনি পাবে প্রাণ।/ অধর পীযূষ রস যদি করে পান।।"

(২) পৃষ্ঠা ৬২, পদ নং ৪৪, মূল পদ: "লোচন অরুণ বুঝলি বড় ভেদ।/ রৈনি উজাগরি গুরুঅ নিবেদ।।/ ততহিঁ জাহ হরি ন করহ লাথ।/ রৈনি গমৌলহ জনিকেঁ সাথ।।/ কুচ কুংকুম মাখল হিঅ তোর।/ জনি অনুরাগ রাগি কর গোর।।/ আনক ভূষণ লাগল অংগ।/ উকুতি বেকত হোঅ আনক সংগ।।/ ভনহিঁ বিদ্যাপতি বজবহুঁ বাধ।/ বড়াক অনয় মৌন পয় সাথ।।" বাঁ দিকে রবীন্দ্রনাথের তর্জমা: "নয়ন অরুণ ইহার ভেদ বুঝিতেছি। রাত্রি জাগরণ গুরু নির্বেদ। [এই ছত্রটি

মূল পঙ্‌ক্তির ঠিক উপরে লেখা ছিল]। হরি আর ভাণ করো না। যার সঙ্গে রাত কাটালে তাঁর কাছে যাও। কুচ-কুঙ্কুম তোর হৃদয়ে মাখল। যেন অনুরাগের রঙ্গে গৌর করিয়াছে। অন্যের ভূষণ অঙ্গে লাগিল। ইহাতে অন্যের সঙ্গ ব্যক্ত হইতেছে। বিদ্যাপতি ভণে, এরূপ বলা ভাল নয়। বড়র অন্যায় মৌন থাকাই উচিত।"

বিদ্যাপতির কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের স্বাক্ষর বহন করছে এই তর্জমাগুলি। তবে লক্ষণীয় যে এই পদগুলি কিন্তু আমাদের জানা বিদ্যাপতির পদাবলী নয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদগুলির অন্তর্ভুক্ত নয় এই মৈথিলী কবিতাগুলি। তথাপি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই মৈথিলী পদসমূহের অর্থ উদ্ধার করেছেন এবং যেখানে নিঃসংশয়িত হতে পারেন নি, সেখানে নিজস্ব ধারণা থেকে অর্থ লিখে তার পাশে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছেন। তাঁর এই উদ্যম, জিজ্ঞাসা ও অনন্ত কৌতূহলকে কুর্নিশ জানাতেই হয়।

বিদ্যাপতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযুক্তি বহুমাত্রিকতায় রঞ্জিত। কখনো সমালোচক রূপে তিনি বিদ্যাপতির কবিতার নেতিবাচক দিক তুলে আনছেন, আবার কখনো সাহিত্যিকের দৃষ্টি দিয়ে বিদ্যাপতির কাব্যমঞ্জুষার মণিখণ্ড মেলে ধরছেন পাঠকের সামনে। কখনো বা এক বিশেষ প্রজ্ঞা নিয়ে সাহিত্যের গভীর তত্ত্বভিত্তিক আলোচনায় অতি সাবলীল ভঙ্গিমায় বিদ্যাপতির কবিতাকে উদাহরণ হিসেবে প্রয়োগ করছেন। তাঁর এইসব প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায়, বিদ্যাপতির কবিতাকে তিনি কতটা নিবিড়ভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। তাই প্রথম দিকের কোন প্রবন্ধে বিরূপ মন্তব্য করলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের অন্যতম প্রধান এই কবির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না থাকলে বারবার রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিদ্যাপতির উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘটতো না এবং তাঁর পদবন্ধও ফিরে ফিরে আসতো না রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রান্তে।

আলোচনার শেষে বলা যায় যে, বিদ্যাপতির প্রসঙ্গযুক্ত এই সব প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বৈষ্ণব পদাবলীর এই 'অভিনব জয়দেব' আধুনিক সাহিত্যানুরাগী পাঠকের কাছে অতি সহজে পৌঁছে যেতে পেরেছেন এবং তাঁর কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান মন্তব্য বাংলা সাহিত্যকে অত্যন্ত ঋদ্ধ করেছে।

সহায়ক গ্রন্থ / পত্রিকা:

১) গ্রিয়ার্সন সম্পাঃ *মৈথিলী পদ সংগ্রহ,* ১৮৮২, এশিয়াটিক সোসাইটি।
২) *ভারতী,* শ্রাবণ ১২৮৮।
৩) *ভারতী,* কার্তিক ১২৮৮।
৪) *ভারতী,* ফাল্গুন ১২৮৮।
৫) *ভারতী,* শ্রাবণ ১২৮৯।
৬) *রবীন্দ্র রচনাবলী শতবার্ষিকী সং,* খণ্ড ১৫, ১৪০৮ বৈশাখ, পঃ বঃ সরকার।
৭) *রবীন্দ্র রচনাবলী,* (খণ্ড ১-খণ্ড ২৮) বিশ্বভারতী।
৮) *সাধনা,* চৈত্র ১২৯৮।